Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যক্তিজীবনের সুন্নতের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না

রোলঃ 228022179

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যক্তিজীবনের সুন্নতের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না

রোলঃ 228022179

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ব্যক্তিজীবনের সুন্নতের গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তামান্না, আইডিঃ 228022179 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ব্যক্তিজীবনের সুন্নতের গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তামান্না

আইডিঃ 228022179

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ব্যাক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব 7

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরবর্তী সুন্নতসমূহ 10

৩। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেস্তয়াক করা উচিত। 11

প্রস্রাব-পায়খানার জন্য যাওয়ার সুন্নত নিয়ম এবং দোয়া। 12

ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া 15

মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নতসমূহ 16

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়কার সুন্নতসমূহ 17

মেসওয়াক করার সুন্নতসমূহ 18

অযুর সুন্নতসমূহ 18

অযু শেষ করার পর কলেমা শাহাদাত পড়বে: 21

অযুর ফরযসমূহ 22

গোসল করার সুন্নত নিয়ম 23

গোসলের ফরযসমূহ 24

আযান ও একামতের সুন্নতসমূহ 24

কেরাআতের সুন্নত সাতটি 28

বৈঠকের সুন্নত তেরোটি 31

নামাযের ফরযসমূহ 32

স্ত্রীলোকের নামায আদায়ের বিশেষ নিয়ম 33

নামাযের যে আদব নারী-পুরুষ 34

জুমার সুন্নতসমূহ 35

পানি পান করার সুন্নতসমূহ 39

লেবাস-পোশাকের সুন্নতসমূহ 41

চুলের সুন্নতসমূহ 42
মাথা একেবারে মুণ্ডানোও সুন্নত। 43
রোগ-চিকিৎসা এবং রোগী দেখার সুন্নতসমূহ...44
সফরের সুন্নতসমূহ 46
বিয়ে শাদীর সুন্নত 49
সন্তান জন্মগ্রহণ করার সময়কার সুন্নতসমূহ..51
মৃত্যু ও তৎপরবর্তী করণীয় 53
শয়ন ও নিদ্রা যাওয়ার সুন্নতসমূহ 55
সামাজিকতার সুন্নতসমূহ...58
গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় দ্বীনি বিষয় 60
এস্তেখারার নামায..62
সালাতুল-হাজত 64
নবী করীমের (সা.) কয়েকটি নূরানী অভ্যাস ও বিশেষ সুন্নতসমূহ...................................66
সুন্নত পালনে কর্তব্য 68

ব্যাক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব

সুন্নাহ শব্দটি মুসলিম সমাজে একটি সুপরিচিত পরিভাষা। সুন্নাহর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে মিসবাহুল মুনীর গ্রন্থকার বলেন, সুন্নাহ শব্দটির আরবি আভিধানিক অর্থ- পথ ও পদ্ধতি, আদর্শ ও রীতিনীতি। আল মুফরাদাত গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, রাসূলের (স.) সুন্নাত, এ কথার অর্থ রাসূলের (স.) আদর্শ যা তিনি পালন করতেন। মহান আল্লাহর সুন্নাত এ কথার অর্থ, মহান আল্লাহ তায়ালার সুমহান পথ ও পদ্ধতি, তাঁর হিকমত এবং তার আনুগত্যের নিয়মকানুন ও পদ্ধতি। 'সুন্নাহ' এ অর্থেই পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

ওলামায়ে হক্কানিরা বলেন, ইসলামি শরীয়তে যখন সাধারণভাবে সুন্নাহ শব্দটি ব্যবহার করা হবে, তখন এর অর্থ দাঁড়াবে নবী (স.) এর আদেশ, নিষেধ কথা, কাজ ও সম্মতি ইত্যাদি। সুন্নাহ বিশ্লেষক আলেমগণ বলেন, বিশেষ করে যে সব বিষয়গুলো পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নয়, কেবল মাত্র রাসূল (স.) হতে বর্ণিত, নির্দেশিত শরীয়তের সে সব বিষয়গুলোকে সুন্নাত বলে। মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাত লাভ করতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ (স.) এর আদর্শের পরিপন্থী যাবতীয় আইন-বিধি, নীতি-আদর্শ, পথ-মত, জাহিলিয়াত ও নাফসানিয়াত পরিহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে অনেক আলোচনা বিদ্যমান।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে রাসূল! (স.) আপনি বলুন! যদি তোমরা আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৩১) আল্লাহতায়ালা আরো বলেন, রাসূল (স.) তোমাদের যা আদেশ দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।(সূরা হাশর : আয়াত ৭) যে রাসূলের (স.) আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, আমি আপনাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরণ করিনি। (সূরা নিসা: আয়াত ৮০) তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (স.) এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব : আয়াত ২১)

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে সুন্নাহর অনুকরণ-অনুস্বরণের জন্য অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআন এ কথাও বলেছে, কেউ যদি সুন্নাহর অনুসরণ না করে, তবে তার

ঈমান যথাযথ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, তোমার পালনকর্তার কসম!! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে অর্থাৎ নবী (স.) কে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টিচিত্তে তা কবুল করে নেবে। (সুরা নিসা: আয়াত ৬৫) তিনি আরও বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে অন্য কোন এখতিয়ার থাকে না। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স.) আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (সূরা আল-আহযাব : আয়াত ৩৬)

ইহ-পরকালীন নাজাত, কল্যাণ ও জান্নাতের পথ শুধুমাত্র কুরআন ও রসূলুল্লাহ (স.) এর আদর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং খোলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কিরামগণের (রা.) এর আদর্শে ও বিদ্যমান। রাসুল (স.) এর আদর্শ সেভাবেই অনুসরণ করতে হবে যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম বিশেষতঃ মুহাজীর ও আনসারগণ (রা.) অনুসরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, মুহাজীর ও আনসারদের অগ্রগামী দল আর যারা যথাযথভাবে তাদের অনুসারী, মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও মহান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তাঁরা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। এটাই হল মহান সফলতা। (সূরা তাওবাহ : আয়াত ১০০)

রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে হুজুর (স.) নিজেই বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক : হাদিস নম্বর ৩৩৩৮।)

খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত সম্পর্কে হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) একদিন আমাদের নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বসলেন। অতঃপর আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় উপদেশ দিলেন যে, চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে গেল এবং হৃদয় ভীত-বিহবল হয়ে পড়ল। এমন সময় একজন বলে উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটা যেন আপনার বিদায়ী ভাষণ। অতএব আপনি আমাদেরকে আরও বেশী উপদেশ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাদের আমীরের আদেশ শুনতে ও মান্য করতে উপদেশ দিচ্ছি যদিও তিনি একজন হাবশী গোলামও হন। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে

থাকবে, তারা অতিসত্বর বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকেই আকড়ে ধরবে। তাকে কঠিনভাবে ধরবে এবং মাড়ির দাঁতগুলো দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। (মুসিলিম : হাদিস নম্বর ১৭১৮; আবু দাউদ : হাদিস নম্বর ৪০৬৭।)

সাহাবাগণের সুন্নাত অনুসরণ-অনুকরণ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। প্রিয় রাসুল (স.) বলেছেন, বানী-ইসরাইলীগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মাত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে, সকলেই জাহান্নামে যাবে, কিন্তু একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে। সাহাবাগণ (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, এই দল কারা? রসূলুলাহ (স.) বললেন, যারা আমার ও আমার সাহাবাগণের সুন্নাতের উপর কায়েম থাকবে। (তিরমিযি : হাদিস নম্বর ২৫৭৮।) বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, সে দল হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরবর্তী সুন্নতসমূহ

(১) ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দুই হাতে চোখ মুখ মৃদু কচলাতে হবে যেন ঘুমের প্রভাব দূর হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল তাই করতেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

(২) প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পর এই দোয়া পড়তে হয়-

প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের ঈমান আনার পর পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং পুনরুত্থান তাঁরই কাছে।

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'য়াদামা আমাতানা ওয়া ইলায়হিন নুশুরি।

অর্থ: সেই আল্লাহ তা'আলার সকল প্রশংসা, যিনি (সাময়িক)

মৃত্যু থেকে আমাদিগকে পুনরায় জীবিত করেছেন। আর আমাদের সকলের শেষ গন্তব্য তাঁরই দিকে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

৩। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেস্তয়াক করা উচিত।

-(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

অতঃপর অযু করার সময়ও মেসওয়াক করতে হবে। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই মেসওয়াক করা একটি স্বতন্ত্র সুন্নত।

-(বযলুলমজহুদ, শরহে আবু দাউদ ১ম খণ্ড)

৪। পাজামা-সেলওয়ার জুতা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পা এবং অতঃপর বাম পা ঢুকাবে। জামা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান হাত আস্তিনে এবং পরে বাম হাত আস্তিনে ঢুকাবে।

আবার পোশাক-জুতা ইত্যাদি খোলার সময় বাম দিক থেকে শুরু করবে। (বুখারী, তিরমিযী, লেবাস অধ্যায়)

৫। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মুখ-হাত ধোয়ার জন্য বা অযু করার উদ্দেশ্যে পানির বর্তনে হাত দেওয়ার আগে তিনবার হাত ধুয়ে

- নেওয়া সুন্নত। -তিরমিযী ১ম খণ্ড)

প্রস্রাব-পায়খানার জন্য যাওয়ার সুন্নত নিয়ম এবং দোয়া।

৬। পায়খানায় যাওয়ার সময় পানি এবং ঢিলা কুলুখ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সুন্নত।

অন্যূন তিনটি ঢিলা নেওয়া মোস্তাহাব। যদি পূর্ব থেকে পায়খানার স্থানে ঢিলা ও পানির ব্যবস্থা করে রাখা হয় তবে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আধুনিক ফ্লাস পদ্ধতির পায়খানার মধ্যে ঢিলা ব্যবহারে সমস্যার সৃষ্টি হয় বিধায় আলেমগণ টয়লেট পেপার ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সুতরাং ঢিলার স্থলে টয়লেট পেপার ব্যবহার করায় সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। লাল গিচৌয়ার্থ চুল

৭। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম টয়লেটে যাওয়ার সময় মাথা ঢেকে এবং জুতা পরে যেতেন।

৮। টয়লেটে প্রবেশ করার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই দোয়া পড়তেন:

ঈশ্বরের নামে, হে ঈশ্বর, আমি আপনার কাছে পাপাচার ও মন্দ জিনিস থেকে আশ্রয় চাই।

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহে আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবেকা মিনাল খুবুছে ওয়াল খাবায়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। ইয়া আল্লাহ্! আমি সব ধরনের নোংরা এবং শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

হাদীসের ব্যাখ্যাতা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লেখেছেন, এই

দোয়া পড়ার বরকতে সব ধরনের ক্ষতিকারক শয়তান এবং দোয়া পাঠকারীর মধ্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি আড়াল সৃষ্টি করে দেওয়া

হয়। যদ্দরুন শয়তান আর সে ব্যক্তির গোপন অঙ্গ দেখতে পারে না।

- (মেরকাত, ১২ খণ্ড)

৯। টয়লেটে প্রবেশ করার সময়ে প্রথমে বাম পা রাখবে।

১০। টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখবে এবং বাইরে এসে এই দোয়াটি পড়বে-

তোমার ক্ষমা। ঈশ্বরের প্রশংসা যিনি আমার থেকে ক্ষতি দূর করেছেন এবং আমাকে সুস্থ করেছেন।

উচ্চারণ : গুফরানাকা আলহামদুলিল্লা হিল্লাযী আযহাবা আন্নীল আযা ওয়া আফা-নী।

অর্থ: আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহ তা'আলারই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমার ভিতর থেকে কষ্টদায়ক উপাদান বের করে দিয়ে আমাকে নিরাময় করেছেন।

১১। টয়লেটে প্রবেশ করার সময় এমন আংটি যার মধ্যে আল্লাহ্ বা রাসূলের নাম কিংবা পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত লেখা থাকে বা এমন কোনো কিছু পরনে থাকে, যার মধ্যে পাক কালাম লেখা থাকে তবে তা খুলে বাইরে রেখে যেতে হবে। বাইরে এসে তা পুনরায় পরিধান করবে। (ইবনেমাজাহ)

তাবীজ যা মোমদ্বারা বদ্ধ করা থাকে বা কোনো কিছুতে সিলাই করা থাকে, কালাম দৃষ্টিগোচর না হয় তবে সেটা পরিধান করা অবস্থায় টয়লেটে যাওয়া যাবে।

১২। মলমূত্র ত্যাগ করার সময় কেবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে বসবে না।-(মেশকাত, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

১৩। মলমূত্র ত্যাগ করার সময় নিতান্ত জরুরি না হলে কথা বলবে না। আল্লাহ তা'আলার জিকিরও করা যাবে না।

-(মেশকাত, আবু দাউদ)

১৪। মলমূত্র ত্যাগ করার সময় প্রস্রাব বা পায়খানার ছিটা থেকে সতর্ক থাকবে। কেননা অধিকাংশ কবর আযাব প্রস্রাবের ছিটা থেকে

সতর্ক না থাকার কারণে হয়ে থাকে। (বুখারী, ইবনে মাজাহ)

১৫। প্রস্রাব করার সময় বা পানি ব্যবহারের সময় ডান হাত ব্যবহার করবে না। বাম হাতে কাজ সারবে। -(বুখারী, আবু দাউদ)

১৬। যে সব স্থানে টয়লেট নেই, সেসব স্থানে এমন আড়ালে প্রস্রাব-পায়খানা করবে, যেখানে কারো দৃষ্টিতে পড়তে না হয়।

-(ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

১৭। প্রস্রাব করার সময় এমন স্থানে করা উচিত, যেন মাটি নরম থাকে, ছিটা না উঠে বরং মাটিতে শোষণ করে নেয়।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ)

১৮। বসে প্রস্রাব করবে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা ঠিক নয়।

-(তিরমিযী)

১৯। প্রস্রাব করার পর কুলুখ নিতে হলে দেয়ালের আড়ালে বা

সাধারণের দৃষ্টির বাইরে করতে হবে। (বেহেশতী গওহর)

২০। সুন্নত হচ্ছে, ওজু বাড়িতে করে মসজিদে যাওয়া।

২১। সুন্নত নামাজ ঘরে পড়ে যাওয়াই উত্তম।

দ্র. বর্তমান যুগে যেহেতু লোকেরা সুন্নত নামাযের প্রতি উদাসীন হয়ে যাচ্ছে, তাই এযুগে সুন্নত মসজিদে পড়াই উত্তম বিবেচিত হবে।

-(কামালাতে আশ্রাফিয়া)

ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া

২২। মসজিদে বা অন্য যে কোনো স্থানে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে

বের হয়ে এই দোয়া পড়া সুন্নত:

ঈশ্বরের নামে, আমি ঈশ্বরের উপর ভরসা করি। ঈশ্বর ছাড়া কোন শক্তি বা শক্তি নেই।

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

অর্থ: আমি আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বের হচ্ছি। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য আর কারো কোনো শক্তি নেই।

-(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

২৩। মসজিদে যাওয়ার সময় শান্তভাবে যাওয়া এবং না দৌড়ানো সুন্নত। (ইবনে মাজাহ
ঘরে প্রবেশের দোয়া

২৪। বাইরে থেকে ঘরে আসার পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়া এবং ঘরের লোকদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া সুন্নত।

হে ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে প্রবেশদ্বারের মঙ্গল এবং বের হওয়ার পথের মঙ্গল কামনা করছি। ঈশ্বরের নামে আমরা প্রবেশ করেছি, এবং ঈশ্বরের নামে আমরা প্রস্থান করেছি এবং ঈশ্বর, আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের ভরসা রেখেছি।

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা খাইরাল মাওলাজি ওয়া খাইরাল মাখরাজি বিসমিল্লাহি ওয়ালাজ না বিসমিল্লাহি খারাজনা ওয়া আলাল্লাহি রাব্বিনা তায়াক্কালনা।

অর্থঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কল্যাণকর প্রবেশ এবং কল্যাণকর নির্গমন প্রার্থনা করি। আমার রব আল্লাহর উপরই একমাত্র ভরসা। (আবু দাউদ)

মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নতসমূহ

১। প্রথমে ডান পা রেখে মসজিদে প্রবেশ করবে।

-(বুখারী, সালাত অধ্যায়)

২। পা বাড়ানোর সময় বিসমিল্লাহ বলবে।

(ইবনে মাজাহ)

৩। নিম্নোক্ত দরূদ শরীফটি পড়বে:

)ইবনে মাজাহ (- আল্লাহর রসূলের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক

উচ্চারণ: আসসালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

৪। নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে:

হে ঈশ্বর, আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিন। (ইবনে মাজাহ)

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়কার সুন্নতসমূহ

১। বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রাখা। (বুখারী)

২। বিসমিল্লাহ পাঠ করা। (ইবনে মাজাহ)

৩। দরূদ শরীফ পাঠ করা:

-)ইবনে মাজাহ (- আল্লাহর রাসূলের উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক

৪। দোয়া পাঠ করা:

ওহ ঈশ্বর, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করুন.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা মিন ফাদ্বলিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

মেসওয়াক করার সুন্নতসমূহ

১। অযু করার সময় মেসওয়াক করা সুন্নত।

(আবু দাউদ ১ম খণ্ড, তারগীব)

২। মেসওয়াক ধারণ করার নিয়ম হচ্ছে, বৃদ্ধাঙ্গুলি নীচে এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিসমূহ উপরে থাকবে। এভাবে মেসওয়াক ধারণ করতঃ দাঁত ঘষা সুন্নত। (শামী ১ম খণ্ড)

অযুর সুন্নতসমূহ

অযুতে মোট আঠারোটা সুন্নত রয়েছে। এগুলি ঠিকমত পালন করলে সহীশুদ্ধভাবে অযু করা হয়ে যাবে।

১। অযুর নিয়ত করা। যেমন- মনে মনে এরূপ সংকল্প গ্রহণ করা যে, আমি নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে অযু করতেছি।

-(নাসায়ী শরীফ, অযুর নিয়ত অধ্যায়)

২। বিসমিল্লাহ পাঠ করে অযু শুরু করা।

কোনো কোনো বর্ণনায় অযু করার সময় পঠিতব্য বিসমিল্লাহ

নিম্নোক্ত রূপে পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। যথা-

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে, এবং ইসলাম ধর্মের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহিল আজিমি ওয়ালহামদু লিল্লাহি আলা দ্বীনিল ইসলামি। -(মারাকিউলফালাহ)

৩। প্রথমে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড)

৪। মেসওয়াক করা: যদি মেসওয়াক না থাকে তবে হাতের অঙ্গুলিদ্বারা হলেও ঘষে দাঁত পরিষ্কার করা। -(মারাকিউলফালাহ)

৫। তিনবার কুলি করা। (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড)

৬। তিনবার নাকে পানি দেওয়া ও নাক পরিষ্কার করা।

৭। রোযাদার না হলে কুলি এবং নাকে পানি দেওয়ার সময় অপেক্ষাকৃত বেশী পানি ব্যবহার করা।

-(আবু দাউদ, মারাকিউলফালাহ)

৮। প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া। -(বুখারী)

৯। মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় দাড়ি খেলাল করা। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড)

দাড়ি খেলাল করার সুন্নত নিয়ম হচ্ছে: তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করার পর হাতের তালুতে সামান্য পানি নিয়ে তা খুঁতনির মধ্যে ঠেকাবে অতঃপর ভিজা হাতের আঙ্গুল দিয়ে দাড়ি খেলাল করবে এবং মুখে বলবে-

অর্থাৎ, এরূপ করার জন্যই আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। -(আবু দাউদ, হযরত আনাসের (রা.) বর্ণনা) - (শামীঃ ১ম খণ্ড)

১০। হাত এবং পা ধোয়ার সময় অঙ্গুলির ফাঁকগুলিতে অঙ্গুলি চালিয়ে খেলাল করা। (আবু দাউদ)

১১। সমগ্র মাথা মসেহ করা। (শামী ১ম খণ্ড)

১২। মাথা মাসেহ করার সময় দুই কান মাসেহ করা। -(নাসায়ী ১ম খণ্ড)

১৩। অযুর অঙ্গসমূহ উত্তমরূপে ঘর্ষণ করে ধৌত করা। -(মারাকী)

১৪। বিরতিহীনভাবে একের পর এক অঙ্গগুলি ধোয়া। -(মারাকী)

১৫। অযুর তরতিব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা। (হেদায়া ১ম খণ্ড)

১৬। অযুর প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা।

(বুখারী)

১৭। মাথার সম্মুখ দিক থেকে মসেহ শুরু করা। (বুখারী ১ম

খণ্ড, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দের (রা.) বর্ণনা)

১৮। ঘাড় মসেহ করা। সম্মুখ ভাগের কণ্ঠনালী মসেহ করবে না। -(মারাকী)

অযু শেষ করার পর কলেমা শাহাদাত পড়বে:

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন শরীক নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।
এরপর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে-

হে আল্লাহ, আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

-(তিরমিযী ১'ম খণ্ড)

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাকে আপনি তওবাকারী এবং সর্বোত্তম পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।

এই দোয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোল্লা আলী কারী (রহ.) লেখেছেন যে, অযু দ্বারা বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জিত হয়। এই দোয়াটি পাঠ করে আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা লাভের জন্য দোয়া করা হয়। বলা হয় যে, মাওলা! বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করার লক্ষ্যে তো অযু সম্পাদন করলাম। এখন আপনি আমার অভ্যন্তরও পাক-পবিত্র করে দিন।

অযুর ফরযসমূহ

উপরে বর্ণিত আঠারোটি বিষয় সুন্নত। আসলে অযুর যে চারটি ফরয রয়েছে, সেগুলো উত্তমরূপে সম্পাদন করার পর সুন্নতগুলো যত্নের সাথে আদায় করলেই পরিপূর্ণ অযু করা হয়। সেই চারটি ফরযের যে কোনো একটি বা একটির অংশবিশেষও যদি ছুটে যায় তবে অযু শুদ্ধ হবে না।

অযুর চারটি ফরয হচ্ছে:

১। পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা।

২। কনুইসহ দুই হাত একবার করে ধোয়া।

৩। মাথার চারভাগের একভাগ একবার মসেহ করা।

৪। টাখনুসহ দুই পা একবার করে ধোয়া।

উপরোক্ত চার অঙ্গের ধৌতকরণের দ্বারাই অযু হয়ে যায়। তবে সুন্নতগুলোসহ অযু করার দ্বারা অযু পূর্ণতা লাভ করে এবং বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।

গোসল করার সুন্নত নিয়ম

প্রথমে দুইহাত কব্জিপর্যন্ত ধুয়ে নিবে। অতঃপর মলমূত্র ত্যাগের রাস্তা ধৌত করবে। এতে মলমূত্র লেগে থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় পেশাব এবং মলত্যাগের অঙ্গ ধৌত করা কর্তব্য।

অতঃপর শরীরের কোনো স্থানে ময়লা বা নাপাক কিছু লেগে থাকলে সেটি ধৌত করতে হবে। তারপর সুন্নত তরিকা অনুযায়ী অযু করবে। এরপর মাথায় তিনবার ডান কাঁধে তিনবার ও বাম কাঁধে তিনবার পানি ঢালবে। পানি এমনভাবে ঢালবে, যেন সমগ্র শরীরে অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি গড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব শরীর এমনভাবে মর্দন করবে, যেন শরীরের কোনো সামান্য অংশও শুষ্ক না থাকে। যদি চুল পরিমাণ জায়গাও শুষ্ক থাকে তবে গোসল শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ শরীরের সব অংশেই পানি প্রবাহিত করতে হবে। অতঃপর গোসল করার স্থান থেকে একটু করে যেখানে গোসলে ব্যবহৃত পানি জমে নাই, সেখানে এসে দুই পা ধুয়ে ফেলবে। অবশ্য যদি গোসলের আগে পূর্ণ অযু করা হয়ে থাকে, তাহলে নতুন করে পা ধোয়া জরুরি নয়। (শামী ১ম খণ্ড, বেহেশতী জেওর)

গোসলের পর ভিজা শরীর শুকনা কাপড় দ্বারা মোছা এবং না মোছা উভয়টাই প্রমাণিত আছে। সুতরাং কেউ যদি মুছে ফেলে কিংবা না মুছে তবে উভয় অবস্থাতেই সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

গোসলের ফরযসমূহ

উপরে গোসলের যে পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে সুন্নত নিয়মে গোসল করার পদ্ধতি। গোসলের মধ্যে কয়েকটি ফরয রয়েছে। সেগুলোর যে কোনো একটি বর্জন করলে গোসল শুদ্ধ হয় না এবং শরীর যথারীতি নাপাক থেকে যায়। সে মতে গোসলের ফরযগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা অপরিহার্য। গোসলের ফরয শুধু তিনটি:

১। কুলি করা, এমনভাবে যে মুখের ভিতরভাগ উত্তমরূপে ধোয়া হয়ে যায়।

২। নাকের ভিতর ভাগের নরম অংশটুকু পর্যন্ত পানি পৌছানো।

৩। সমগ্র শরীরে পানি পৌঁছানো, এমনভাবে যে শরীরের সামান্য কোনো অংশ যেন শুকনা না থাকে। (বেহেশতী জেওর)

আযান ও একামতের সুন্নতসমূহ

১। আযান এবং একামত কেবলার দিকে মুখ করে দেওয়া সুন্নত।

-(মারাকিউলফালাহ, এলাউসসুনান)

২। আযানের বাক্যগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করা এবং একামতের শব্দগুলো দ্রুত বলা সুন্নত। (তিরমিযী)

৩। আযানে হাইয়্যা আলাস্সালাহ বলার সময় মুখমণ্ডল ডান দিকে এবং হাইয়্যা আলালফালাহ বলার সময় মুখমণ্ডল বামদিকে ঘুরানো সুন্নত।

তবে বক্ষদেশ ও দু'পা কেবলা রুখই স্থির রাখতে হবে।

-(মারাকিউলফালাহ, শামী ১ম খণ্ড).

৪। মোয়াজ্জেনের মুখে আযানের শব্দগুলো শোনার সময় মোয়াজ্জেন যা বলে তাই মনে মনে উচ্চারণ করবে। তবে হাইয়্যা আলাস্ সালাহ হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময় বলবে- লা-হাউলা

ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। (বুখারী, মুসলিম)

৫। ফজরের আযানে মোয়াজ্জেন যখন "আস্সালাতু খাইরুম মিনান নাউম" বলবে তখন জবাবে বলতে হবে- সাদাকতা ওয়া বাৱারতা। (বুখারী, মুসলিম)

৬। একামতের জবাবও আযানের মতই দিতে হবে। তবে ক্বাদক্বামাতিস্ সালাহর জবাবে "আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা" বলবে। (আবু দাউদ)

৭। আযানের জবাব দেওয়ার পর দরূদ শরীফ পড়া সুন্নত।

-(মুসলিম শরীফ, ১ম খণ্ড)

৮। আযান শেষের দোয়া:

হে ঈশ্বর, এই নিখুঁত আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত প্রার্থনার পালনকর্তা, মুহাম্মদকে উপায় ও পুণ্য দান করুন এবং তাকে প্রশংসিত স্থানে উঠান যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাকে দিয়েছিলেন। তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহিদ দাওয়াতিত তামমাতি ওয়াস সালাতিল ক্বা-য়িমতি আ-তি মুহাম্মাদিনিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদ্বিলাতা ওয়াবআছহু মাক্বামাম মাহমূদা নিল্লাজী ওয়াত্তাহ ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ। (বুখারী)

অর্থ: আয় আল্লাহ্ [আপনিই তো] এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং যে নামায কায়েম হবে তার রব। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আপনি ওসীলা ও ফযীলত দান করুন। আর তাঁকে পৌঁছে দিন মাকামে মাহমুদে। আপনি যে বিষয়ে ওয়াদা করেছেন। নিঃসন্দেহে আপনি ওয়াদার অন্যথা করেন না। -(বাইহাকী)

[ইন্নাকা লা তুখলেফুল মীআদ বাক্যটি বুখারী শরীফে নেই। ইমাম বাইহাকী সুনানুনকোবরায় উল্লেখ করেছেন।

কোন কোন লোক ওয়াদদারাজাতার রাফীয়াহ এবং ইয়া আর হামার রাহেমীন সংযুক্ত করে থাকেন। কিন্তু হাদীসের বর্ণনায় এইটুকু পাওয়া যায় না। মোল্লা আলী কারী ইমাম সালাবীর হাওয়ালায় বর্ণনা করেন যে, কোনো বর্ণনায়ই এই অংশটুকু উল্লেখিত হয়নি।

মোল্লা আলী ক্বারী আরও লিখেছেন যে, এই দোয়াটি যারা আযানের বাক্য শ্রবণ করার সময় মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে তাদের খাতেমা বিল-খায়ের এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামের শাফায়াত পাওয়ার আশা করা যায়।-(মেরকাত)

নামাযে একান্নটি সুন্নত

কিয়ামে এগারোটি সুন্নত:

১। তকবীর-তাহরিমার সময় মাথা সোজা করে দাঁড়ানো। মাথা

নীচু করে না রাখা। (তাহতাবী)

২। দুই পায়ের মধ্যখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে দাঁড়ানো। (তাহতাবী)

পায়ের আঙ্গুলগুলিও কেবলার দিকে রুখ করে রাখা। (শামী)

কোনো কোনো ফেকাহবিদ দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের মধ্যে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা মোস্তাহাব বলেছেন। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, ফেকাহর কিতাবাদিতে সুন্নতে যায়েদাকে মোস্তাহাব এবং অনেক মোস্তাহাব যা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমল করেছেন; এমন মোস্তাহাব আমলকে সুন্নত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(শামী)

৩। মোক্তাদির তকবীর-তাহরীমা ইমামের তকবীর-তাহরীমার সঙ্গে সঙ্গে হওয়া সুন্নত।

(তাহতাবী)

স্মরণীয় যে, মোক্তাদির তকবীর-তাহরীমা যদি ইমামের তকবীর-তাহরীমার আগেই হয়ে যায় তবে এক্তেদা শুদ্ধ হবে না।

(তাহতাবী)

৪। তকবীর-তাহরীমা বলার সময় দুই হাত কান বরাবর উঠানো।

-(আবু দাউদ, ১ম খণ্ড)

৫। হাতের তালু কেবলার দিকে রাখা।

(তাহতাবী, শামী)

৬। হাতের আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক রাখা অর্থাৎ ফাঁক করা বা

মুঠিবদ্ধ না রাখা)। (তাহতাবী)

৭। তাহরীমা বাঁধার পর ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের

উপর রাখা। (তাহতাবী)

৮। ডান হাতের কনিষ্ঠ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা বাম হাতের কজি ধরে

রাখা। (তাহতাবী)

৯। মাঝের তিনটি অঙ্গুলি কজির উপর রাখা।-(তাহতাবী)

১০। নাভীর নীচে হাত বাঁধা। (শামী, তাহতাবী)

১২। 'সানা' পাঠ করা। (এলাউসুনান)

কেরাআতের সুন্নত সাতটি

১। আউযুবিল্লাহ পড়া। (তাহতাবী)

২। প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া। (তাহতাবী)

৩। অনুচ্চ স্বরে আমীন বলা। (তাহতাবী)

৪। ফজর এবং যোহরের নামাযে লম্বা সূরা অর্থাৎ সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত, আছর এবং এশার নামাযে মধ্যম আকারের সূরা যথা সূরা বুরুজ থেকে লাম ইয়াকুনিল্লাযী পর্যন্ত এবং মাগরিবের নামাযে ছোট সূরা অর্থাৎ লাম ইয়াকুনের পর থেকে সূরা নাস্ পর্যন্ত যে কোনো সূরা পাঠ করা সুন্নত। (তাহতাবী)

৫। ফজরের প্রথম রাকাতে দীর্ঘ কেরাআত পড়া। (তাহতাবী)

৬। সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং আমীন নিঃশব্দে পড়া। -(মারাকিউল ফালাহ)

৭। ফরয নামাযের ৩য় ও চতুর্থ রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করা। (তাহতাবী)

রুকুর আটটি সুন্নত

১। রুকুতে যাওয়ার সময় তকবীর বলা। (তাহতাবী)

২। রুকুর সময় উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধারণ করা। - (তাহতাবী)

৩। হাঁটু ধরে রাখার সময় দুই হাতের আঙ্গুল ছড়িয়ে রাখা।

-(তাহতাবী)

৪। রুকু অবস্থায় পিঠ সমান্তরাল করে রাখা। (শামী)

৫। রুকুর সময় পায়ের গোছা সোজা রাখা। (শামী)

৬। নিতম্ব এবং মাথা সমান্তরাল রাখা। (শামী ১ম খণ্ড)

৭। রুকুর মধ্যে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম পড়া।

৮। রুকু থেকে উঠার সময় ইমামের সামিয়াল্লাহু লেমান হামিদাহ উচ্চৈঃস্বরে বলা এবং মোক্তাদিগণকে অনুচ্চস্বরে "রাব্বানা লাকালহামদ" বলা।

রুকুর পর শান্তভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া। (শামী ১ম খণ্ড)

সেজদা করার সময়কার সুন্নত বারোটি

১। সেজদায় যাওয়ার সময় তকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা।

-(শামী ১ম খণ্ড)

২। সেজদায় প্রথমে দুই হাঁটু মাটিতে রাখা। (শামী)

৩। অতঃপর দুই হাত রাখা। ঐ

৪। অতঃপর নাক মাটিতে রাখা। ঐ

৫। অতঃপর ললাট মাটিতে স্থাপন করা। ঐ

৬। সেজদার সময় মাথা দুই হাতের মধ্যে রাখা। ঐ

৭। সেজদায় পেট উরু থেকে ফাঁকে রাখা, দুই হাতও পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে রাখা। (তাহতাবী)

৮। উভয় কনুই মাটিতে না লাগানো। (তাহতাবী)

৯। সেজদায় গিয়ে তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" পাঠ করা।

১০। সেজদা থেকে উঠার সময় তকবীর বলা। (শামী)

১১। সেজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে ললাট, তারপর নাক অতঃপর দুই হাত এবং তারপর হাঁটু উঠানো।

-(শামী ১ম খণ্ড, তাহতাবী)

১২। দুই সেজদার মধ্য খানে শান্তভাবে বসা। (তাহতাবী)

বৈঠকের সুন্নত তেরোটি

১। বসার সময় ডান পা খাড়া রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা। (তাহতাবী)

২। উভয় হাত উরুর উপরে রাখা। (তাহতাবী)

৩। তাশাহহুদ পড়ার সময় আশহাদু আল লা-ইলাহা বলতে গিয়ে শাহাদাত অঙ্গুলি উপর দিকে উঠানো এবং ইল্লাল্লাহ পড়ার সময় আঙ্গুল নীচে ঝুকিয়ে ফেলা। (তাহতাবী)

৪। শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াতুর পর দরূদ শরীফ পাঠ করা।

-(তাহতাবী)

৫। দরূদ শরীফ পড়ার পর কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত কোনো একটি দোয়ায়ে-মাছুরা পাঠ করা। (তাহতাবী)

৬। ডান এবং বাম উভয়দিকে সালাম ফিরানো। (তাহতাবী)

৭। সালাম ডান দিক থেকে শুরু করা। (তাহতাবী)

৮। সালাম ফিরানোর সময় ইমাম সাহেবের নিয়ত থাকতে হবে স্বীয় মোক্তাদিগণ, ফেরেশতাগণ এবং নেককার জিনদের যাঁরা ডানে বামে উপস্থিত আছেন। তাঁদের প্রতি সালাম করা হচ্ছে।

-(তাহতাবী)

৯। মোক্তাদিগণের নিয়ত থাকবে ইমাম, ফেরেশতাগণ, জিন্নাত এবং যেসব মোক্তাদি তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাদের প্রতি সালামের নিয়ত করতে হবে। (তাহতাবী)

১০। যে ব্যক্তি একা একা নামায পড়ছেন তার নিয়ত থাকবে শুধু ফেরেশতাগণকে সালাম দেওয়া হচ্ছে। (তাহতাবী)

১১। ইমামের সঙ্গে সঙ্গে মোক্তাদিগণেরও সালাম ফিরানো। (তাহতাবী)

১২। প্রথম সালামের তুলনায় দ্বিতীয় সালামের আওয়াজ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ করা। (তাহতাবী)

১৩। যে ব্যক্তি পরে এসে জামাতে শরীক হয়েছেন তাঁকে ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ছুটে যাওয়া নামাযটুকু পড়ার জন্য দাঁড়ানো। (তাহতাবী)

নামাযের ফরযসমূহ

১। তাকবীরে-তাহরীমা, (২) দাঁড়ানো, (৩) কেরাআত, অর্থাৎ কুরআন শরীফের যে কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করা। (৪) রুকু করা, (৫) প্রতি রাকাতে দু'টি করে ছেজদা করা, (৬) শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা পরিমাণ বসা।

যদি উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্য থেকে যে কোনো একটি ছুটে যায় তবে নামায হবে না। এই নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে।

দ্রষ্টব্য: নামাযের ওয়াজেবসমূহ: যে যে কারণে নামায বাতিল হয়ে যায়, সেসব মাসআলা বেহেশতী যেওর বা অন্য কোন ফেকাহর কিতাবে দেখে নিবেন।

স্ত্রীলোকের নামায আদায়ের বিশেষ নিয়ম

১। স্ত্রীলোকগণ তকবীর-তাহরীমা বলার সময় দু'হাত পুরুষদের মত কান পর্যন্ত না উঠিয়ে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন। আর হাত শাড়ী বা ওড়নার ভিতর থেকে বের করবেন না।- (তাহতাবী)

২। বুকের উপর হাত বাঁধবেন। ডান হাতটা বাম হাতের পিঠের

উপর রেখে দিবেন। (তাহতাবী)

৩। রুকুতে পুরুষের তুলনায় কম ঝুঁকবেন। দুই হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে হাঁটুর উপর স্থাপন করবেন। হাতের আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে রাখবেন না। উভয় বাহু পার্শ্বদেশের সাথে চেপে রাখবে। দুই পায়ের গোড়ালী মিলিয়ে দাঁড়াবে। (তাহতাবী)

৪। সেজদার সময় পুরুষের ন্যায় দু'পা খাড়া রাখবে না বরং ডান পাশে বিছিয়ে দিবে। উদর উরুর সাথে ও দুই বাহু দুই পাশে যথাসাধ্য চেপে, কনুই মাটিতে বিছিয়ে সেজদা করবে।

-(বেহেশতী যেওর, ২য় খণ্ড)

৫। বৈঠকের সময় দুই পা ডান দিকে বিছিয়ে বাম দিকে নিতম্ব মাটিতে স্থাপন করে বসবে। দুই হাত উরুর উপর রাখবে। আঙ্গুলগুলি যথাসাধ্য মিশিয়ে রাখবে। (তাহতাবী, শামী, ১ম খণ্ড)

নামাযের যে আদব নারী-পুরুষ

উভয়ের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সেজদার স্থানে, রুকু অবস্থায় দুই পায়ে, সেজদারত অবস্থায় নাকের উপর, বসা অবস্থায় হাঁটুর দিকে এবং সালাম ফিরানোর সময় কাঁধের উপর নিবদ্ধ রাখতে হবে।

নামাযরত অবস্থায় হাই উঠলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ করে তা দমন করতে হবে। যদি কাশির প্রকোপ হয়, তাহলেও যথাসম্ভব তা দমন

করতে সচেষ্ট থাকতে হবে। -(মুফতী সায়ীদ আহমদ, মাদরাসা মাজাহেরুল উলুম)

ফরয নামাযে সালাম ফিরানোর পর তিনবার "আস্তাগফেরুল্লাহ" পড়া সুন্নত।

অতঃপর নিম্নোক্ত যে কোনো একটি দোয়া পড়া সুন্নত।

হে ঈশ্বর, তুমিই শান্তি এবং তোমার থেকেই শান্তি। হে মহিমার অধিকারী এবং পরম উদার আপনি ধন্য।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আপনি শান্তিময়; শান্তির একমাত্র উৎস আপনি। একমাত্র আপনার নিকট থেকেই শান্তি পাওয়া যেতে পারে। আপনি বরকতের আধার। ওহে মাহাত্ম্য এবং দয়ার আকর। (হিসনে হাসীন, ফতহুল কাদীর ১ম খণ্ড)

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

অর্থ: এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নাই। সমস্ত আধিপত্য একমাত্র তাঁরই মালিকানাধীন, সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। আর তিনি সবকিছুর উপরই শক্তিমান। -(হিসনে হাসীন)

হে আল্লাহ, আমি কাপুরুষতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, জীবনের অপমান থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, দুনিয়ার ফিতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

অর্থ: ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার পানাহ চাই কাপুরুষতা থেকে। আর আপনার আশ্রয় চাই বার্ধক্যজনিত অকর্মণ্যতা থেকে। আর আপনার পানাহচাই দুনিয়ার ফেতনা থেকে। আর পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে।

জুমার সুন্নতসমূহ

১। গোসল করা। (বুখারী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

২। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উত্তম পোশাক পরিধান করা। (আবু দাউদ)

৩। মসজিদে আগে ভাগে পৌছার চেষ্টা করা।

-(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৪। পায়ে হেঁটে মসজিদ পর্যন্ত যাওয়া। (ইবনে মাজাহ)

৫। ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করা।

-(ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

৬। কাতার পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর অন্যের ঘাড় টপকে সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা না করা। (আবু দাউদ)

৭। মসজিদে প্রবেশ করার পর পরনের কাপড় বা মাথার কেশ অনর্থক নাড়াচাড়া না করা। (ইবনে মাজাহ)

৮। ইমামের খুতবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

* জুমার দিন যে ব্যক্তি সূরা কাহফ তেলাওয়াত করবে, তার জন্য আরশের তলদেশ থেকে আকাশ পর্যন্ত উঁচু একটি নূর প্রকাশ পাবে। এই নূর কেয়ামতের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে তার উপকারে আসবে। আর সে জুমার দিনের সকল ছগীরা গোনাহ আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দেবেন।

* হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

জুমার দিন আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ করো। এই দিন সব দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। (ইবনে মাজাহ)

জুমার দিন মাথায় তেল দেওয়া এবং সুগন্ধি ও আতর ব্যবহার করা সুন্নত। (বুখারী)

খাদ্য গ্রহণের কয়েকটি সুন্নত

১। দস্তরখানা বিছিয়ে খানা খাওয়া। -(বুখারী)

২। দু'হাতই কজি পর্যন্ত ধোয়া। (তিরমিযী)

৩। স্পষ্ট উচ্চারণে বিসমিল্লাহ পড়া। -(বুখারী, মুসলিম, শামী)।

৪। ডান হাতে খাওয়া। (বুখারী, মুসলিম)

৫। খানার মজলিসে সব চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বুযুর্গ ব্যক্তির দ্বারা খানা শুরু করানো। -(মুসলিম, হযরত হোযাইফা (রা.) এর বর্ণনা)

৬। একাধিক ব্যক্তি এক সঙ্গে একই থালায় খানা খাওয়ার সময় যদি খানা এক ধরনের হয় তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামনের দিক থেকে খানা গ্রহণ করা। (বুখারী, মুসলিম)

৭। যদি হাত থেকে লোকমা পড়ে যায়, তবে তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে নেওয়া। (মুসলিম)

৮। কোনো আসনে হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ না করা।

-(বুখারী, আবু দাউদ)

৯। খানার কোনো ত্রুটি বের না করা। (বুখারী, মুসলিম)

১০। পায়ে জুতা থাকলে তা খুলে খানা খাওয়া। (মেশকাত)

১১। উপড়ি বসে, এক পা বিছিয়ে বসা বা হাঁটু ভেঙ্গে জমিনে বসে বা আসনে বসে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে খানা খাওয়া।

-(মেরকাত, শরহে মেশকাত)

১২। খানার বরতন, পেয়ালা, প্লেট পরিষ্কার করে রাখা। এরূপ করলে বরতনও খাদ্য গ্রহণকারীর গোনাহ মাফের জন্য দোয়া করে থাকে। (ইবনে মাজাহ) শিকিলে।

১৩। খাওয়ার শেষে হাতের আঙ্গুল চেটে খাওয়া। -(মুসলিম)

১৪। খানার শেষে দোয়া পড়া। যথা-

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং আমাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন।

১৫। খানা শেষে দস্তরখানা উঠিয়ে নেওয়ার পর নিজে উঠা।

-(ইবনে মাজাহ)

১৬। দস্তরখানা উঠিয়ে নেওয়ার সময়কার দোয়াটি পড়া। যথা- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًافِيهِ.

অর্থ: আল্লাহ তায়ালারই সকল প্রশংসা পবিত্র বরকতময়।

১৭। খানার শেষে উভয় হাত ধোয়া। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

১৮। কুলি করা। (বুখারী)

১৯। খানার শুরুতে যদি বিসমিল্লাহ বলতে ভুল হয়ে যায় তবে বলবে- বিসমিল্লাহে আওয়ালুহু ওয়া আখেরুহু।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ)

২০। কারো মেহমান হয়ে খানা খেলে মেজবানকে এই বলে দোয়া করবে-

হে ভগবান, যে আমাকে খাওয়ায় তাকে খাওয়াও এবং যে আমাকে পান করলো তাকে পান কর।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! যে আমাকে খাওয়াইল তাকে তুমি খাওয়াইও।

যে আমাকে পান করালো তাকে পান করাইও। -(মুসলিম)

২১। খানার সাথে সিরকা ব্যবহার করা সুন্নত।

২২। গমের সাথে সামান্য যবও মিশিয়ে নেওয়া উত্তম, যেন সুন্নতের উপর আমল হয়ে যায়।

২৩। গোশত খাওয়া সুন্নত। রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানেই খানার সরদার হচ্ছে গোশত।

-(জামে সগীর)

২৪। মুসলমান ভাইদের দাওয়াত গ্রহণ করা সুন্নত।

-(আবু দাউদ)

তবে যদি দাওয়াতকারীর আমদানির মধ্যে সুদ-ঘুষ থাকে ৰাসে ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে গোনায় লিপ্ত থাকে তবে তার দাওয়াত গ্রহণ করা চলবে না।

২৫। যে পরিবারের কেউ মারা যায় তাদেরকে খানা খাওয়ানো বা তাদের বাড়িতে খানা পাঠানো সুন্নত।

পানি পান করার সুন্নতসমূহ

১। পানি ডান হাতে পান করা সুন্নত। শয়তান বাম হাত দিয়ে পান করে। (মুসলিম শরীফ)

২। পানি পান করার সময় দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে বসে পড়বে। দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা নিষেধ। (মুসলিম)

৩। বিসমিল্লাহ বলে পান করা এবং পান করার পর আলহামদুলিল্লাহ বলা সুন্নত। -(তিরমিযী)

৪। তিন শ্বাসে পান করবে এবং শ্বাস ছাড়ার সময় পানপাত্র মুখের সামনে থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিতে হবে। (মুসলিম, তিরমিযী)

৫। গ্লাস বা পেয়ালার এক পার্শ্ব যদি ভাঙ্গা থাকে। তাহলে পান করার সময় ভাঙ্গা দিকটা যেন মুখে না লাগে সে ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। (আবু দাউদ)

৬। পানির বড় পাত্র যা থেকে সামান্য অসতর্ক হলেই বেশী পানি একসাথে বের হয়ে আসতে পারে বা অন্য যে কোনো কষ্টদায়ক কিছু বের হয়ে আসতে পারে এরূপ পাত্রের মধ্যে মুখ লাগিয়ে পান করবে না। -(বুখারী, মুসলিম)

৭। শুধু পানি পান করার পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়া সুন্নত। যথা-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا مَاءً عَذْبًا فَرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا .

অর্থ: আল্লাহ তায়ালার সমস্ত প্রশংসা যিনি স্বীয় করুণায় আমাদিগকে সুপেয় পানি পান করতে দিয়েছেন। আমাদের গোনাহর

কারণে লবণাক্ত ও পানের অযোগ্য করে দেননি।
-(তফসীর রুহুল মাআনী)

৮। পানি পান করার পর যদি অন্য কাউকে গ্লাস দিতে হয় তবে যিনি ডান দিকে রয়েছেন, তাঁকে প্রথমে দিবে। এভাবে উপস্থিত অন্যান্যদেরকে ডানদিকের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী পরিবেশন করবে।

-(বুখারী, মুসলিম)

চা এবং শরবত পান করার সময়ও এই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

৯। দুধ পান করার পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে-

হে ঈশ্বর, আমাদের জন্য এটি আশীর্বাদ করুন এবং এটি বৃদ্ধি করুন।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাদিগকে এই দুধে বরকত দান করুন। আর আমাদের জন্য আরও বেশী নছিব করুন।
১০। রিবেশনকারী ব্যক্তি সকলের শেষে পান করবে।

-(তিরমিযী)

লেবাস-পোশাকের সুন্নতসমূহ

১। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাদা পোশাক বেশী পছন্দ করতেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

২। কামিস, কোর্তা, সদরি ইত্যাদি পরিধান করার সময় প্রথমে

ডান হাত আস্তিনে প্রবেশ করাবে অতঃপর বাম হাত। এভাবে পাজামা সেলওয়ার পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পা এবং অতঃপর বাম পা

ঢুকানো সুন্নত। -(তিরমিযী)

৩। পাজামা, সেলওয়ার, লুঙ্গি ইত্যাদি পায়ের টাখনুর নীচে পরা নিষিদ্ধ, এতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যারা টাখনুর নীচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পোশাক পরিধান করে ওদের প্রতি আল্লাহ্ পাক রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। (বুখারী, মুসলিম)

৪। নতুন কাপড় পরিধান করে এই দোয়া পড়বে-

ঈশ্বরের প্রশংসা যিনি আমাকে এই পোশাক পরিয়েছেন এবং আমার পক্ষ থেকে কোন শক্তি বা শক্তি ছাড়াই আমাকে প্রদান করেছেন।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই, যিনি এই কাপড় আমাকে দান করেছেন ও পরিয়েছেন আমার কোনো শক্তি সামর্থ ছাড়াই।

৫। কেউ যদি পাগড়ি পরিধান করে তবে পাগড়ির নীচে টুপি পরা সুন্নত।-(মেরকাত)

৬। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোর্তা পরতে বেশী পছন্দ করতেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

৭। কালো রংএর পাগড়ী পরাও সুন্নত। পাগড়ীর শামলা রাখাও সুন্নত। (নাসায়ী)

৮। টুপি পরাও সুন্নত। (মেরকাত)

৯। জামা-কোর্তা খোলার সময় প্রথমে বাম হাত অতঃপর ডান হাত খুলবে। পাজামা-সেলওয়ার খোলার সময়ও প্রথমে বাম দিক হতে শুরু করা বিধেয়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

চুলের সুন্নতসমূহ

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাথার কেশের দৈর্ঘ সাধারণতঃ কানের অর্ধেক পর্যন্ত হতো, কখনও কান পর্যন্ত এবং কোনো কোনো সময় কানের লতি পর্যন্ত বা কাছাকাছি দীর্ঘ হতো।

-(শামায়েলে তিরমিযী)

২। মাথার কেশ কানের লতি পর্যন্ত বা তার চাইতে কিছু বেশি লম্বা রাখা সুন্নত।

মাথা একেবারে মুণ্ডানোও সুন্নত।

যদি চুল ছাটার ইচ্ছা হয় তবে সমগ্র মাথার চুল একই রকম ছোট করে ছাঁটা জায়েয। কিন্তু সম্মুখ দিকে লম্বা এবং পিছনের দিকে হেঁটে ছোট করে ফেলা যেটাকে আধুনিক ফ্যাশন মনে করা হয় এভাবে চুল

ছাঁটা শরীয়ত অনুমোদিত নয়। মাথার এক অংশ মুণ্ডন করে অন্য অংশের চুল লম্বা রাখাও শরীয়ত অনুমোদিত নয়।

--(বেহেশী জেওর ১ম খণ্ড)

৩। দাড়ি লম্বা করে গোঁফ খাটো করার নির্দেশ হাদীস শরীফে

এসেছে। -(বুখারী, মুসলিম)

দাড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্টির কম রাখা হারাম।

-(বেহেশতী জেওর ১ম খণ্ড)

দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজেব। পরিমাণ কমের পক্ষে

এক মুষ্টি হওয়া সুন্নত। (বুখারী)

৪। গোঁফ সম্পূর্ণরূপে ছেঁটে ফেলা সুন্নত। গোঁফ লম্বা রাখার ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠিন নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

-(আওজাযুলমাছালেক)

৫। নাভীর নীচের কেশ, বগলের কেশ, গোঁফ এবং নখ কেটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রিাখা বিধেয়। যদি চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়

এবং পরিচ্ছন্ন না করে তবে গোনাহগার হবে।

(বেহেশতী জেওর)

৬। মাথায় চুল থাকলে সেগুলো ধৌত করা, তেল লাগানো ও চিরুনী করা সুন্নত। যদি প্রয়োজন না থাকে তবে দু'এক দিন নাগা করা যেতে পারে। (মেশকাত, আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ -(বযলুলমজহুদ)

৭। মাথা আঁচড়ানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করা
৮। চিরুনী করার সময় বা অন্য যে কোনো সময় যদি আয়না ব্যবহার করে তবে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে এই দোয়া পড়বে: (ina a). ils das als es eyan

অর্থ : হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে উত্তম অবয়ব দান করেছেন আমার স্বভাব-চরিত্রও ভাল করে দিন।

রোগ-চিকিৎসা এবং রোগী দেখার সুন্নতসমূহ

১। রোগ হলে চিকিৎসা করানো এবং ওষুধ খাওয়া সুন্নত।

চিকিৎসার সাহায্য নেওয়ার পরও আরোগ্য লাভের জন্য ভরসা একমাত্র আল্লাহ্র উপর রাখতে হবে।ালি

২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঔষধরূপে মধু এবং কালো জিরা ব্যবহার করেছেন। -(বুখারী শরীফ)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মধু ও কালোজিরার মধ্যে রোগ আরোগ্যের গুণ রেখেছেন।

একাধিক হাদীসে এ দুটি দ্রব্যের ঔষধি গুণ সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে।

৩। চিকিৎসা চলার সময় ক্ষতিকারক সামগ্রী থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

৪। রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সুন্নত।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা রোগীদের দেখতে যেয়ো। -(বুখারী)

সাহাবী হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে এসেছিলেন।

৫। রোগী দেখে যথাসম্ভব দ্রুত চলে আসা উচিত। রোগীর পাশে দীর্ঘক্ষণ অর্থহীন অবস্থানের কারণে রোগী বা তার সেবাযত্নে যারা নিয়োজিত আছেন, তাদের বিরক্তির কারণ ঘটে কিনা সে দিকে খেয়াল রাখা উচিত।

৬। রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নত। যেমন বলবে যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে তুমি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। নৈরাশ্য বা ভয়ের কোনো কথা রোগীর সামনে বলবে না।

৭। রোগীর সামনে গিয়ে বলবে-ُالأَبَاسَ طَهُورُ إِنْشَاءَ الله .

অর্থ : চিন্তার কোনো কারণ নেই, এই অসুস্থতার দ্বারা

ইনশাআল্লাহ্ তোমার গুনাহ-খাতা মাফ হয়ে যাবে অতঃপর রোগীর আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে সাতবার নিম্নোক্ত বাক্যটি পাঠ করবে—

T অর্থ : আমি মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি, যিনি মহিমান্বিত

আরশের অধিকারী, তিনি তোমাকে সুস্থ করে দিন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, এই দোয়াটি রোগীর নিকট সাতবার পাঠ করলে রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। অবশ্য মৃত্যু যদি তার নিকটবর্তী হয়ে না থাকে।

সফরের সুন্নতসমূহ

১। সফরে বের হওয়ার সময় কমপক্ষে একজন সঙ্গী নেওয়া উচিত। একাকী সফরে বের হওয়া ঠিক নয়।

তবে সঙ্গী যদি সংগ্রহ করা না যায় এবং সফর খুবই জরুরি হয়

তবে একাকী যাওয়াতে দোষের কিছু হবে না। —(ফতহুলবারী)

২। যানবাহনে পা রাখার সময় বিসমিল্লাহ বলবে। — (তিরমিযী)

৩। যানবাহনে ঠিকমতো বসার পর তিনবার আল্লাহু আকবার বলবে এবং নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে—

অর্থ : মহাপবিত্র সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য এই সোয়ারী দান করেছেন আমরা এই যানবাহনকে বশ করতে পারতাম না। নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার সমীপে ফিরে যাবো। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করবে—

অর্থ : ইয়া আল্লাহ! এই সফর আমাদের জন্য সহজ করে দাও। সহজে দূরত্ব অতিক্রম করিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ্! আপনিই এই সফরে আমাদের সঙ্গী, আপনিই আমাদের সফরের বন্ধু। দেখা শোনার মালিক ঘরবাড়ির, ইয়া আল্লাহ্! পানাহ চাই আপনার নিকট সফরের কষ্ট থেকে। মন্দ কোনো কিছু দেখা হতে, আর ফেরত এসে যে কোনো মন্দ অবস্থায় ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজন এবং সন্তানদের কোনো প্রতিকুল পরিস্থিতিতে পতিত দেখা হতে।”

৫। পথ চলতে গিয়ে যদি কোথাও যাত্রাবিরতি করতে হয় তাহলে রাস্তা ছেড়ে অবস্থান নেওয়া সুন্নত। যেন যাতায়াতকারীদের কোনো অসুবিধার কারণ না হয় এবং তাদের কষ্ট না হয়।

– (মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড)

৬। সফর করা অবস্থায় যানবাহন যদি উঁচু স্থানে উঠতে থাকে তবে আল্লাহু আকবার বলবে। —(বুখারী)

৭। উপর থেকে নীচে নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলবে।

—(বুখারী

দ্রঃ মেশকাত শরীফের শরাহ মেরকাতে বলা হয়েছে, কেউ যখন নিজের বাড়ীতে বা মসজিদে যাওয়ার সময় প্রথমে সিঁড়িতে ডান রাখবে এবং “আল্লাহু আকবার' বলবে। অনুরূপ নীচে নামার সময় বাম পা আগে রেখে প্রতি পদক্ষেপে 'সুবহানাল্লাহ' বলা উচিত। এর দ্বারাও সুন্নতের সওয়াব আশা করা যায়।

হাদীস শরীফের বিখ্যাত ভাষ্যকার মোল্লা আলী কারী (রহ.) লিখেছেন, উপর দিকে উঠার সময় "আল্লাহু আকবার" বলার উদ্দেশ্য।

হচ্ছে, মনে মনে এরূপ একটা অভিব্যক্তি প্রকাশ করা যে, ইয়া আল্লাহ্! বাহ্যতঃ যদিও আমি উপর দিকে উঠছি, কিন্তু সবকিছুর উপরে তো আপনার স্থান। আর নীচের দিকে নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ্! আমরা নীচে অবস্থান করি, কিন্তু আপনি এর থেকে পবিত্র

শহর বা জনপদে যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে সেখানে পৌঁছার পর তিনবার নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে—

এ

অর্থ : ইয়া আল্লাহ্! এই জনপদে অবস্থান বরকতময় করুন।

৯। অতঃপর এরূপ দোয়া করবে– ইয়া আল্লাহ্! এই শহরের ফল-ফসলাদি আমাদের জন্য সহজলভ্য করুন। শহরবাসীর দৃষ্টিতে আমাকে বা আমাদিগকে প্রিয় করে দিন এবং এই জনপদের নেক লোকদের অন্তরে আমাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দিন।

১০। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন– কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সফর থেকে ফিরে আসবে। অপ্রয়োজনে সফরে থাকা মঙ্গলজনক নয়। — (বুখারী)

১১। দূরবর্তী সফরের যদি গভীর রাতে ফিরে আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই গৃহে প্রবেশ করা ঠিক নয়। বরং উত্তম হচ্ছে সকাল হওয়ার পর ঘরে প্রবেশ করা। - (মেশকাত শরীফ)

অবশ্য যদি বাড়ীর লোকেরা তোমার ফিরে আসার বিষয়ে আগে থাকতেই অবগত থাকে এবং অপেক্ষমাণও থাকে তাহলে গভীর রাতে গৃহ প্রবেশ দূষণীয় হবে না। — (মেরকাত)

বর্ণিত এই সুন্নত তরিকাগুলোর উপর আমল করলে দ্বীন এবং

দুনিয়ার কল্যাণ লাভ হবে।
১২। সফরে কুকুর এবং বানর সঙ্গে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

(মুসলিম) কেননা, এ দু'টি প্রাণীর পিছু পিছু শয়তান লেগে যায় এবং এর দ্বারা সফরের বরকত বিনষ্ট হয়ে যায়।

১৩। দূরবর্তী সফর থেকে ফিরে আসার পর প্রথমে মহল্লার মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করে বাড়ীতে প্রবেশ করা উত্তম।

-(মেশকাত)

১৪। সফর থেকে ফিরে আসার পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে-

আমরা অনুতপ্ত, আমাদের পালনকর্তার উপাসক, কৃতজ্ঞ।

অর্থ: আমরা ফিরে আসলাম তওবা করে আল্লাহ্ বন্দেগী করে আর আমাদের রবের প্রশংসাকীর্তনকারী রূপে।

-(মুসলিম, তিরমিযী)

বিয়ে শাদীর সুন্নত

১। মসনূন বরকতপূর্ণ বিয়ে হচ্ছে সেইটি যাতে ব্যয়বাহুল্য এবং জাঁকজমক পরিহার করতঃ সহজ সরলভাবে সম্পন্ন হয়।

-(মেশকাত শরীফ)

২। বিয়ের জন্য সৎকর্মশীল উত্তম চরিত্রের কন্যা তালাশ করে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো সুন্নত। (মেশকাত, আবু হুরায়রার বর্ণনা)

৩। শাওয়াল মাসে এবং জুমার দিনে মসজিদে বিয়ে অনুষ্ঠান

সুন্নত। (মেরকাত ১ম খণ্ড)

৪। বিবাহ অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে এবং প্রচার করা সুন্নত।

-(মেশকাত)

৫। দেইন-মোহরের পরিমাণ বরের সামর্থের মধ্যে নির্ধারিত করা সুন্নত। (মেশকাত, ১ম খণ্ড)

৬। প্রথম বাসর রাতে স্ত্রীর ললাটে হাত রেখে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়া সুন্নত-

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ এবং আপনি যা সৃষ্টি করেছেন তার সর্বোত্তম চাই।

আর আমি আপনার কাছে এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই এবং যা দিয়ে আপনি একে সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।

অর্থ: ইয়া আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এই স্ত্রীলোকের কল্যাণকর আচরণ প্রার্থনা করি এবং এর অকল্যাণকর আচার-আচরণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

৭। প্রথম সহবাসের প্রস্তুতিকালে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে।

এতে শয়তানের উপস্থিতি প্রতিহত হবে এবং সন্তান আসলে তার উপর শয়তানের কোনো প্রভাব পড়বে না।

ঈশ্বরের নামে, হে ঈশ্বর, আমাদের শয়তানকে রক্ষা করুন এবং শয়তানকে রক্ষা করুন যা আপনি আমাদের দিয়েছেন।

অর্থ: আল্লাহর নাম স্মরণ করে শুরু। হে আল্লাহ্! আমাদিগকে শয়তান থেকে রক্ষা করুন এবং আপনি আমাদিগকে যে সন্তান দান করবেন তাকেও শয়তানের সংস্রব থেকে দূরে রাখুন।

-(বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

এই দোয়া পাঠ করার ফলে যদি কোনো সন্তান গর্ভে আসে তবে তাকে শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

ওলীমা

১। বাসর রাতের পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন এবং গরীব-মিসকীনকে নিয়ে ওলীমা অনুষ্ঠান সুন্নত। এই সুন্নত আদায় করার জন্য বড় আয়োজনের প্রয়োজন নেই। নিজের সামর্থ অনুযায়ী অল্প খানা দ্বারাও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। যে আয়োজনে শুধু বড়লোকদের দাওয়াত

করা হয় এবং গরীব-মিসকীনকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয় সেরূপ খানার আয়োজনকে আল্লাহর নবী অত্যন্ত মন্দ আয়োজন বলে অভিহিত করেছেন। (বুখারী)

এ ধরনের মন্দ আয়োজন থেকে আত্মরক্ষা করা জরুরী।

সুন্নত অনুযায়ী ওলীমা করতে হলে তাতে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলকেই দাওয়াত করতে হবে। বিশেষতঃ দ্বীনদার ও গরীবদের বেশী সম্মান দিতে হবে। যদি বড়লোকি প্রকাশ এবং যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষায়
আয়োজন করা হয় তবে তদ্দ্বারা সুন্নত ওলীমা হবে না। পরন্তু এরূপ অনুষ্ঠান আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির কারণ হবে।

সন্তান জন্মগ্রহণ করার সময়কার সুন্নতসমূহ

১। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামতের শব্দগুলো উচ্চারণ করা সুন্নত।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ)

২। বাচ্চার বয়স সাত দিন হওয়ার পর তার একটি ভাল নাম রাখবে। (আবু দাউদ)

৩। সপ্তম দিবসে আকীকা করবে।-(আবু দাউদ)

সপ্তম দিনে না হলে চৌদ্দ দিনে, না হলে একুশ দিনের মাথায় আকীকা করা যেতে পারে।

৪। সপ্তম দিবসে শিশুর মাথা মুণ্ডন করতঃ সেই চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা করা সুন্নত। -(তিরমিযী)

৫। মাথা মুণ্ডন করার পর মাথায় জাফরান লাগানো সুন্নত।

(আবু দাউদ)

৬। ছেলে সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করা চলে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৭। আকীকার গোস্ত কাঁচা বা পাক করে বন্টন করা যেতে পারে। (বেহেশতী জেওর)

৮। আকীকার গোশত দাদা-দাদী, নানা-নানী সবাই খেতে পারবেন। (বেহেশতী জেওর)

৯। কোনো একজন বুযুর্গ ব্যক্তির দ্বারা খেজুর (খোরমা) চিবিয়ে শিশুর মুখে দেওয়া এবং দোয়া করা কর্তব্য।(বুখারী)

১০। শিশুর বয়স সাত বছর হলে পর তাকে নামায এবং দ্বীনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিবে।

১১। শিশুর বয়স যখন দশ বছর হয়ে যায় তখন শাসন করে হলেও নামাযে অভ্যস্ত করতে হবে।-(মেশকাত)

শিশুদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান এবং আমল-আখলাকে অভ্যস্ত করার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে দেখা যায়। তারা এমন একটি ধারণায় পতিত থাকেন যে, বড় হলে এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ওমনিতেই সেরে যাবে। কিন্তু তারা চিন্তা করে দেখেন না যে, যে কোনো ইমারতে প্রথম ইটটি যদি সঠিক স্থানে সোজা করে স্থাপন করা না হয়, তবে পরবর্তী ইটগুলো কোনো অবস্থাতেই সোজা হয় না।

মৃত্যু ও তৎপরবর্তী করণীয়

১। যখন মৃত্যুর আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন পার্শ্ববর্তীগণের কর্তব্য হচ্ছে, মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মুখ কেবলার দিকে ফিরিয়ে

দেওয়া। -(মুসতাদরাক হাকেম)

২। মৃত্যু সুনিশ্চিত হওয়া অবস্থায় নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে-

হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে সর্বোচ্চ সহচরের সাথে যুক্ত করুন।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দিন। আমার উপর রহম করুন এবং আমাকে পৌঁছে দিন উর্ধ্ব জগতের বন্ধুদের মধ্যে!

-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

৩। যখন রুহ বের হওয়ার অবস্থা হয় তখন এই দোয়া পাঠ করবে

হে ঈশ্বর, আমাকে মৃত্যুর গভীরে এবং মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে সাহায্য করুন।

অর্থ : ইয়া আল্লাহ্! মৃত্যুর এই কঠিন মুহূর্তে আমাকে সাহায্য

করুন। -(তিরমিযী)

৪। মুত্যু হয়ে যাওয়ার পর আশপাশে যারা থাকেন, সেই

সম্পর্কিতরা নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে-

আমরা আল্লাহরই এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ, আমার বিপদে আমাকে রক্ষা করুন

আর আমাকে এর চেয়ে ভালো কিছু দাও।

অর্থ: আমরা সবাই আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্বাধীন এবং অবশ্যই তাঁর নিকট ফিরে যাবো। আয় আল্লাহ্! এই মুসীবতে আমাকে প্রতিদান দেন এবং এর পরিবর্তে আরও উত্তম প্রতিফল দান করুন।

-(মুসলিম)

৫। রুহ বের হয়ে যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির দুই চোখের পাতা বন্ধ করে দিবে।

৬। মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় উঠানো বা জানাযার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়বে।

৭। মৃত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব দ্রুত দাফন করা সুন্নত।

৮। লাশ কবরে রাখার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে-

আল্লাহ্‌র নামে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের দ্বীনে, আল্লাহ্

অর্থ: আল্লাহ্ নামে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিল্লাতের মধ্যে।

-(মেশকাত, তিরমিযী)

৯। লাশ কবরে এমনভাবে রাখতে হবে যেন চেহারা এবং বক্ষদেশ কেবলার দিকে এবং পিঠ কবরের দেয়ালে লাগানো থাকে। চিৎ করে শোয়ায়ে শুধুমাত্র মুখ কেবলার দিকে ঘুরিয়ে দিলে সুন্নত আদায় হয় না। (তাহতাবী)

১০। মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গ এবং আপনজনকে খানা দেওয়া সুন্নত। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

১১। লাশ দাফনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমাদের এই ভাইয়ের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক। যেন মুনকার-নকীরের সওয়াল-জবাবের মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকতে পারে এবং তিনি নিজেও দোয়া করতে থাকতেন। (আবু দাউদ, হাকেম)

১২। দাফনের পর কেবলার দিকে মুখ করে দোয়া করা সুন্নত। জানাযার শেষে দোয়া করার কোনো প্রমাণ নেই।

-(মেরকাত, বাহরুর রায়েক)

শয়ন ও নিদ্রা যাওয়ার সুন্নতসমূহ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিম্নবর্ণিত সব ধরনের শয্যা ব্যবহার করেছেন।

১। চাটাই, পাটি, কাপড়ের বিছানা, শুধুমাত্র জমিনের উপর ও খাট, চারপায়ী, চামড়া বিছিয়ে তার উপর। (যাদুল মাআদ)

২। শয়ন করার আগে অযু করা সুন্নত। -(আবু দাউদ)

৩। শয়ন করার আগে বিছানা কাপড় দ্বারা অন্ততঃ তিনবার ঝেড়ে নেওয়া সুন্নত। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

৪। শয়নের আগ মুহূর্তে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা সুন্নত:

বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করা, বাতি নিভিয়ে দেওয়া, পানির পাত্রের মুখ বন্ধ করা, বর্তন-পেয়ালা ঢেকে দেওয়া।

-(মুসলিম)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কেউ জ্বলন্ত বাতি রেখে ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান ইঁদুরকে সেই বাতি এদিক সেদিক নিয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটানোর জন্য উস্কানি দিতে থাকে। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, বছরের অন্ততঃ একটি রাতে রোগ মহামারি নাযিল হয়ে থাকে। পানি বা খাবারের পাত্র খোলা থাকলে তাতে কিছু পরিমাণে হলেও সেই মহামারির জীবাণু সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

-(মুসলিম)

যদি পাত্র ঢাকবার মত কোনো কিছু পাওয়া না যায় তবে অন্ততঃ একটি কাঠি বা কাঠের টুকরা হলেও আড়াআড়িভাবে বিসমিল্লাহ বলে পাত্রের মুখের উপর রেখে দিবে। (মুসলিম)

৫। এশার নামাযের পর গল্প-গোযারী করার জন্য জাগ্রত থাকা নিষিদ্ধ। নামায শেষ হওয়ার পর পরই বিছানায় চলে যাওয়া উচিত। তবে রোযী-রোজগারের কোনো কাজে বা ধর্মীয় আলোচনা শ্রবণ করা বা পড়া শোনা করার জন্য জাগ্রত থাকা দূষণীয় নয়।

৬। নিদ্রা যাওার প্রাক্কালে চোখে তিন তিনবার করে সুরমা লাগানো নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সুন্নত। (শামায়েলে তিরমিযী)

শোয়ার আগ মুহূর্তে কুরআন শরীফের কোনো সূরা বা আয়াত অবশ্যই পাঠ করবে। যেমন, আলহামদুলিল্লাহ, আয়াতুল কুরসী, সূরা মূলক, চার কুল, দরূদ শরীফ ইত্যাদি। যদি বেশী পড়া না যায় তবে দু' এক সূরা বা আয়াত হলেও অবশ্যই পড়বে। এই অভ্যাসের দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের অনেক কল্যাণ আশা করা যায়।

৭। ঘুমাবার আগে "তসবীহ ফাতেমী" নিয়মিত পড়ার অভ্যাস করবে। তসবীহটি হচ্ছে-সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ৩৪ বার।

৮। ডানপাশে কেবলার দিকে মুখ করে শোয়া সুন্নাত। উপুড় হয়ে শোয়া নিষেধ। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

৯। বিছানায় শুয়ে এই দোয়া পড়বে-

তোমার নামে, আমার প্রভু, আমি আমার পক্ষ স্থাপন করি, এবং যদি আমি এটিকে ধরে রাখি তবে তোমার দ্বারা আমি এটি তুলে ধরি।

আমার আত্মা, তাই আমাদের ক্ষমা করুন এবং যদি আমি এটি চাই, তবে আপনি যা দিয়ে এটি রক্ষা করেন তা দিয়ে রক্ষা করুন।

তোমার ধার্মিক বান্দারা।

অর্থঃ হে আমার রব! তোমার নাম নিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিতেছি, আর তোমার অনুগ্রহেই আবার উঠবো। যদি ইতোমধ্যে আমার প্রাণবায়ু নিয়ে যাও, তবে ক্ষমা করে দিও। আর যদি পুনরায় ফিরিয়ে দাও, তাহলে একে হেফাজত করো, যেমন হেফাজত করে থাক তোমার নেকবখত বান্দাদেরকে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

১০। অতঃপর এই দোয়াটি পড়বে-

হে ভগবান, তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি।

অর্থ: ইয়া আল্লাহ্! আমার জীবন-মৃত্যু সবই তোমার পবিত্র নামের সাথে। (বুখারী, মুসলিম)

১১। নিদ্রা যাওয়ার প্রাক্কালে নিম্নোক্ত দোয়াটি তিনবার পড়বে-
আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবী, আত্মপ্রতিষ্ঠাকারী এবং অনুতপ্ত।

-(তিরমিযী)

১২। যদি স্বপ্নে ভয় পাওয়ার মতো কোনো কিছু দৃশ্যমান হয় এবং চোখ খুলে যায় তাহলে বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে এবং "আউযুবিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রাজীম" তিনবার পাঠ করে পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঘুমিয়ে পড়বে। -(মুসলিম)

সামাজিকতার সুন্নতসমূহ

১। পরস্পরের সাক্ষাতের সময় সালাম আদান-প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সুন্নতটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে মোহব্বত সৃষ্টি হয়। পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকেই সালাম দেওয়া কর্তব্য। (বুখারী)

কেননা, সালাম একটি ইসলামী হক, পরস্পর পরিচিত হওয়া শর্ত নয়।

২। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদল শিশুর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি শিশুদেরকে সালাম দিলেন। এতে বোঝা গেল যে, শিশুদেরকেও সালাম দেওয়া সুন্নত। -(মুসলিম)

৩। সালাম দেওয়ার সুন্নত নিয়ম হচ্ছে, মুখে স্পষ্ট উচ্চারণে-আস্সালামু আলাইকুম বলবে। হাতে বা আঙ্গুলের ইশারায় সালাম করা বা সালামের জবাব দেওয়া সুন্নত পরিপন্থী। যদি দূর থেকে সালাম আদান-প্রদান করতে হয় তাহলে মুখে সালাম উচ্চারণ করার সাথে হাতেও ইশারা দেওয়া যেতে পারে।-(মেশকাত শরীফ)

৪। কোনো মুসলমান ভাইয়ের অন্য মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হলে সালামের পর মোসাফাহা করা সুন্নত। স্ত্রীলোকগণ স্ত্রীলোকের
সাথে মোসাফাহা করতে পারবেন।-(মেশকাত)

৫। কোনো মজলিসে গেলে যেখানেই সুবিধাজনক স্থান পাওয়া যায় সেখানেই বসে যাওয়া কর্তব্য। অন্যকে উঠিয়ে নিজে বসা গোনাহের কাজ। (বুখারী, মুসলিম)

৬। যদি কোনো আগন্তুক আপনার সাথে সাক্ষাত করতে আসে, তবে নিজের আসন থেকে একটু নড়েচড়ে বসবে যাতে নতুন আগন্তুকের বসার সুবিধা হয়, এটাও সুন্নত। এতে আগন্তুকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

৭। কোথাও যদি তিন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তবে একজনকে রেখে দু'জনে কানাকানি করার অনুমতি নেই। এতে তৃতীয় ব্যক্তির মনে অহেতুক সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে এবং সে নিজেকে অপমানিত মনে করতে পারে। এভাবেও কোনো মুসলমানের মনে কষ্ট দেওয়া গোনাহের কাজ।

৮। কারো বাড়ীতে যেতে হলে তার অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করবে। অনুমতি না নিয়ে কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা কবীরা গোনাহ।

-(মেশকাত শরীফ)

৯। হাই উঠলে সাধ্যমত তা বন্ধ রাখতে চেষ্টা করতে হবে। যদি বন্ধ করা সম্ভব না হয় তাহলে বাম হাতের পৃষ্ঠদেশ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হবে। আর যাতে মুখ থেকে শব্দ বের না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। কেননা, হাদীস শরীফে এরূপ শব্দ করে হাই তুলতে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

১০। কারো উত্তম অর্থবোধক নাম শুনে তদ্দ্বারা সুলক্ষণ মনে করা এবং আনন্দবোধ করা সুন্নত। চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, কোনো কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা নিষিদ্ধ। যেমন, পথ চলতে গিয়ে হাঁচি এলে, এরূপ মনে করা যে, এটি কাজ নষ্ট হওয়ার লক্ষণ। তেমনি, কাকের শব্দ শোনা, বাঁদর চোখে পড়া, পেচকের আওয়াজ শোনার দ্বারা কোনো বিপদ আসার আলামত মনে করা মোটেও ঠিক নয়। তেমনি কোনো ব্যক্তিকে বা বিশেষ কোনো দিনকে অলক্ষুনে মনে করা অর্থহীন একটি গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নয়। (মেরকাত)

মনে রাখতে হবে যে, সুন্নতের উপর আমল করার দ্বারা বান্দা আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। সুতরাং তার উপর কোনো অপয়া অলক্ষণ প্রভাব ফেলতে পারে না।

মনের মধ্যে কোনো প্রকার কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হলে

কোনো পাপ চিন্তা মনে উদয় হলে তৎক্ষণাৎ আউযুবিল্লাহে মিনাশ্ শাইতানির রাজীম এবং আমান্ত বিল্লাহ পড়বে।

চিন্তা-ফিকির

আল্লাহ তায়ালার স্বরূপ ও অস্তিত্ব বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা চিন্তা মনে উদয় হয়ে তা তাৎক্ষণিকভাবে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

হাদীস শরীফে রয়েছে-"আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব এবং স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে না, চিন্তা করবে তাঁর সৃষ্টিজগতসম্পর্কে। কেননা, আল্লাহ তায়ালার স্বরূপ সম্পর্কে কোনো ধারণায় উপনীত হওয়ার

বিষয়টি তোমাদের সাধ্যায়ত্ব নয়। (তরগীব-তারহীব)

চিন্তা-ভাবনা কেবল সৃষ্টিজগত নিয়েই হতে পারে, আল্লাহর অস্তিত্ব ও স্বরূপ নিয়ে নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, “এবং তারা চিন্তা করে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে।” -(বয়ানুল কুরআন)

গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় দ্বীনি বিষয়

ক. যে ব্যক্তি রাসূলের (সা.) নির্দেশ মান্য করলো, প্রকারান্তরে সে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করলো। (কুরআন ৫ম পারা)

খ. সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আমাদের কম বয়সীদের প্রতি স্নেহ, বেশী বয়স্কদের প্রতি সম্মান এবং সৎকর্মে উৎসাহ প্রদান ও মন্দকর্মে বাধা না দেয়। -(তিরমিযী শরীফ)

গ. যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জান বা মালের ক্ষতি করে কিংবা কোনো মুসলমানকে ধোঁকা দেয়, সে অভিশপ্ত। -(তিরমিযী)

ঘ. দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে, যেন তুমি একজন মুসাফির। -(বুখারী শরীফ)

ঙ. প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যার যবান ও হাতের অনিষ্টকারিতা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী)

চ. পিতা-মাতার প্রতি মন্দ আচরণের প্রতিফল পার্থিব জীবনেও ভোগ করতে হয়।-(মেশকাত শরীফ)

ছ. অবশ্যম্ভাবী পাঁচটি বিষয়ের আগে পাঁচটি বিষয়কে আশীর্বাদ মনে করো।

১. যৌবনকে বার্ধক্য আসার আগে,

২. সুস্থতাকে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার আগে,

৩. স্বচ্ছলতাকে কঠিন দারিদ্র্য আসার আগে,

৪. অবকাশকে কঠিন ব্যস্ততায় নিমজ্জিত হওয়ার আগে,

৫. জীবনকে মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার আগে। -(তিরমিযী)

এস্তেখারার নামায

প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এস্তেখারা করা সুন্নত। এস্তেখারা অর্থ কাজটি যেন মঙ্গলজনক ও সহজে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে প্রতিটি খুত্বপূর্ণ কাজের আগে এস্তেখারা শিক্ষা দিতেন। যেরূপ গুরত্ব সহকারে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। বলতেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে মনস্থ কর তখন দু'রাকাত নামায পড়ে এস্তেখারার দোয়াটি পাঠ করবে। (বুখারী)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আনাস (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- যদি কোনো বিষয়ে তোমার মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তখন পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে সঠিক নির্দেশ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এস্তেখারা করবে। প্রয়োজনে পর পর সাতদিন এস্তেখারা করবে। অতঃপর তোমার মনের গতি যে দিকে

ধাবিত হয় সেদিকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আর এটাকেই তোমার জন্য কল্যাণকর মনে করবে। (শামী, ১ম খণ্ড)

এস্তেখারা করতে গিয়ে স্বপ্নযোগে বিশেষ কোনো নির্দেশ প্রাপ্তি বা কোনো প্রকার আওয়াজ শোনা শর্ত নয়। এস্তেখারা নিজে করতে হবে। অন্যের দ্বারা এস্তেখারা করানোর কোনো দলীল নেই। অন্যের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে, এটা সুন্নত। হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে, যে ব্যক্তি শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করে, সে অনুতপ্ত হয় না। অনুরূপ যে ব্যক্তি এস্তেখারা করে কাজে হাত দেয়, সে বিফল মনোরথ হয় না।

যদি কোনো কাজে এস্তেখারা করার মত সময়-সুযোগ পাওয়া না যায় তাহলে শুধুমাত্র এস্তেখারার দোয়া পাঠ করাই যথেষ্ট। যদি এস্তেখারার দোয়াও স্মরণে না থাকে তবে সংক্ষিপ্ত এই দোয়াটি পড়ে হলেও আল্লাহর সাহায্য চাইবে। সংক্ষিপ্ত দোয়াটি হচ্ছে-

হে ঈশ্বর, আমার জন্য চয়ন করুন এবং আমার জন্য চয়ন করুন।

ইস্তেখারার দোয়া

হে আল্লাহ, আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আপনার নির্দেশনা চাই, আমি আপনার ক্ষমতার মাধ্যমে আপনার কর্তৃত্ব চাই, এবং আমি আপনার মহান অনুগ্রহ চাই, কারণ আপনার ক্ষমতা আছে এবং আমি পারি না, এবং আপনি জানেন এবং আমি জানি না।

আমি জানি, এবং আপনি অদৃশ্যের জ্ঞানী - হে ঈশ্বর, যদি আপনি এটি জানেন

বিষয়টি আমার জন্য আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের ফলাফলের দিক থেকে, আমার নিকটবর্তী জীবনে এবং আমার ভবিষ্যতে উভয় ক্ষেত্রেই উত্তম, সুতরাং আমার জন্য এটি নির্ধারণ করুন এবং আমাকে এর সুসংবাদ দিন, তারপর আপনি যদি জানেন তবে আমাকে তাতে বরকত দিন। এই বিষয়টি আমার ধর্ম, আমার জীবিকা এবং আমার ফলাফলের জন্য খারাপ।

আমার বিষয় এবং এর আশু বিষয়, সুতরাং এটাকে আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে দাও এবং আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমার জন্য কল্যাণের নির্দেশ দাও যেখানেই থাকুক এবং তারপর আমাকে তাতে সন্তুষ্ট কর।

অর্থ: ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করি, আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে। সামর্থ প্রার্থনা করি, আপনার সীমাহীন কুদরতের সাহায্যে। প্রার্থনা করি আপনার অনুগ্রহ, নিঃসন্দেহে আপনি শক্তিধারণ করেন। আমি অসহায় দুর্বল, আপনি জানেন, আমি জানি না, আর আপনি গায়ব সম্পর্কে একমাত্র মহাজ্ঞানী।

ইয়া আল্লাহ! যদি এই কাজটি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী আমার দ্বীন-ঈমান, আমার জীবন-জীবিকা ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর হয় তবে এটি আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন এবং এটা আমার জন্য সহজ করে দিন। এর মধ্যে বরকত দান করুন।

আর যদি আপনার এলেম অনুযায়ী এই কাজটি আমার জন্য, আমার দ্বীন ও জীবন-জীবিকার পক্ষে বা আখেরাতের জীবনে অকল্যাণ করা হয়, তাহলে এটি আমার নিকট হতে দূর করে দিন এবং যা আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাই আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন এবং আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।

এই দোয়াটি বিশেষ মনোযোগের সাথে পাঠ করার পর মনের গতি যেদিকে ধাবিত হয়, সেটাই কল্যাণকর মনে করবে।

সালাতুল-হাজত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, কারও যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজনে আল্লাহ তায়ালার তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিংবা পার্থিব কোনো প্রয়োজনে কারও নিকট কোনো সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় তখন সে উত্তমরূপে অযু করতঃ দু'রাকাত নামায আদায় করবে অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে:

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি সহনশীল, পরম দয়ালু। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহর জন্য পবিত্রতা এবং প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তার জন্য। হে ঈশ্বর, আমি তোমার রহমতের কারণ এবং তোমার ক্ষমার মাধ্যম এবং সমস্ত ধার্মিকতার লুণ্ঠন এবং সমস্ত পাপ থেকে নিরাপত্তার অধিকার নিয়েছি - তুমি তাকে ক্ষমা না করে আমাকে একটি পাপ ছেড়ে দিও না, আপনি তাকে তাদের উদ্বেগ থেকে মুক্তি দেননি, এবং এমন কোন প্রয়োজন নেই যার জন্য আপনি সন্তুষ্ট হন যদি না আপনি তা পূরণ করেন, হে পরম করুণাময়।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। যিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল

অর্থাৎ তিনি শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন না। তিনি মহান দাতা, তিনি দান করার ব্যাপারে যোগ্যতার বিচার করেন না, অর্থাৎ যার যা প্রাপ্য নয় তাও তাকে দেন। পবিত্র তিনি যিনি আরশে-আজীমের রব! সব ধরনের প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য নির্ধারিত। ইয়া আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করি আপনার রহমতের দরজায় এবং আপনার ক্ষমার ইচ্ছার কাছে সব ধরনের নেকী এবং সব ধরনের মন্দ থেকে সুরক্ষার। আমার সব গোনাহ মাফ করে দিন। আমার সব ধরনের দুশ্চিন্তা দূর করে দিন। আমাদের সকল প্রয়োজন যা আপনার সন্তুষ্টি মোতাবেক হয় তা পূর্ণ করে দিন। হে মহা ক্ষমাশীল ও দয়ালু! - (তিরমিযী শরীফ, ১ম খণ্ড)

সব ধরনের দোয়ার আগে ও পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, আল্লামা আবু ইস্হাক শাতেবী (রহ.) বলেছেন, দরূদ শরীফ আল্লাহ তায়ালা অতি অবশ্যই কবুল করেন, আর আল্লাহ তায়ালার মহানুভব চরিত্র থেকে এমনটা হতে পারে না যে, আরজির এক অংশ কবুল করবেন এবং অন্য অংশ কবুল করবেন না।

সুলায়মান দারানী (রহ.) বলেন, দোয়ার আগে ও পরে দরূদ শরীফ পড়লে দোয়া কবুল হয়। কেননা, দয়ালু মহান আল্লাহ এক বান্দার দোয়ার প্রথম অংশ ও শেষ অংশ কবুল করবেন, মধ্যখানে যা প্রার্থনা করা হয় তা কবুল করবেন না, তা তাঁর দয়াগুণের অনুকূল নয়!

-(শামী)

সুতরাং দুনিয়া বা আখেরাতের ব্যাপারে যখনই কোনো বিপদ দেখা দেয় কোনো শারীরিক বা রূহানী পেরেশানীর সম্মুখীন হয় তখন দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে উপরোক্ত দোয়াটি আগেপিছে দরূদ শরীফ সহ পাঠ করলে অবশ্যই আল্লাহর রহমত হবে।

নবী করীমের (সা.) কয়েকটি নূরানী অভ্যাস ও বিশেষ সুন্নতসমূহ

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পথ চলার সময় তাঁর সম্মুখ দিক থেকে লোকজনকে হটিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হতো না।

২. কাউকে কোনো বৈধ কাজ থেকে নিষেধ করতেন না। কেউ কিছু চাইলে দেওয়ার মত হলে হ্যাঁ বলে দিতেন অন্যথায় চুপ করে থাকতেন।

৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে কেউ কথা বললে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি অন্য দিকে না ফিরতো, ততক্ষণ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। যদি কেউ চুপি চুপি কথা বলতে চাইতো তাহলে সেই ব্যক্তির মুখের দিক কান বাড়িয়ে দিতেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত তার কথা শেষ না হতো ততক্ষণ কান সরাতেন না।

৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়ে বিদায় দিতেন:

আমি তোমার দ্বীন, তোমার বিশ্বস্ততা এবং তোমার জন্য সর্বোত্তম মোহর আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পছন্দনীয় কোনো কিছু দেখলে বলতেন:

প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর কৃপায় ভালো কাজগুলো সম্পন্ন হয়।

অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন:

- সকল অবস্থাতেই আল্লাহর প্রশংসা - (ইবনে মাজাহ)

৬। কেউ সাক্ষাত করতে আসলে প্রথমে সালাম দিতেন। -(শামায়েল)

৭. কোনো কিছু দেখতে হলে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখতেন। অহঙ্কারীদের ন্যায় আড়চোখে দেখতেন না। (শামায়েল)

৮. লজ্জার কারণে কারো চোখে চোখ রেখে কথা বলতেন না।

-(খাসায়েল)

৯. কারো সাথে কখনও কঠোর আচরণ করতেন না। নিতান্ত দয়াদ্র আচরণ করতেন।-(মেশকাত)

১০. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চলার সময় সম্মুখ দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বিনয় ও লজ্জাশীলতার সাথে চলতেন। লোকেরা যেভাবে কোনো উঁচুস্থান থেকে নীচের দিকে অবতরণ করতে থাকে, তাঁর পথ চলার ভঙ্গি ছিল অনেকটা সেই রকম। (খাসায়েল)

১১. মজলিসে সবার সাথে মিলে-মিশে থাকতেন। নিজের উপবেশনের জন্য বিশেষ কোনো আসন বা পরিবেশ সৃষ্টি করতেন না। কখনও কখনও পরিবেশ হালকা করার লক্ষ্যে উপস্থিতদের সাথে হাসি-ঠাট্টাও করতেন। (বেহেশতী জেওর)

১২. পথে ঘাটেও কোনো গরীব মানুষ কিংবা বৃদ্ধা যদি কথা বলতে চাইতো তবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পথের। পার্শ্বে তার কথা শোনার জন্য প্রয়োজনে বসে পড়তেন।

-(বেহেশতী জেওর)

১৩. সর্বক্ষণ অন্তর মধ্যে আল্লাহর ভয় এমনভাবে জাগ্রত থাকতো যে, নামাযে কেরাআত পাঠ করার সময় বুকের ভিতর থেকে ফুটন্ত হাঁড়ির শব্দের ন্যায় শব্দ বের হতে থাকতো। (শামায়েল)

১৪. প্রত্যেকের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তাঁর দ্বারা যেন কারও কোনো কষ্ট বা বিরক্তির সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতেন। গৃহে

প্রবেশ করার সময় বা রাতে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় সন্তর্পণে জুতা পরিধান করতেন। সন্তর্পণে দরজা খুলতেন যাতে কেউ নিদ্রিত থাকলে তার আরামে ব্যাঘাত সৃষ্টি না

হয়।-(মেশকাত শরীফ)

১৫. পথ চলার সময় দৃষ্টি অবনত রাখতেন। দলবল নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি পিছনে থাকতেন। অন্য কাউকে এদিকে আসতে দেখলে সর্বপ্রথম তিনিই সালাম দিতেন। (শামায়েল)

১৬. যে কোনো ধরনের সম্মানিত ব্যক্তির সাথে সম্মানপূর্ণ ব্যবহার করতেন।

১৭. সময় ভাগ করে এক অংশ এবাদত-বন্দেগীর জন্য, এক অংশ পরিবার-পরিজন ও লোকজনের জন্য এবং এক অংশ শরীরের হক পূরণ করার জন্য নির্ধারিত করে রাখতেন। (শামায়েল)

সুন্নত পালনে কর্তব্য

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। (নশরুত্-ত্বীর)

২. প্রতিবেশীদের সাথে সদাচারণ করা, বড়দের সম্মান দেখানো এবং ছোটদের প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করা সুন্নত।

-(মেরকাত ১ম খণ্ড)

৩. আত্মীয়-এগানাদের মধ্যে কেউ যদি অসদাচরণ করে তবুও তার সাথে সম্পর্ক যাতে নষ্ট না হয় সেরূপ সদাচরণ করতে হবে।

-(মেশকাত শরীফ)

৪. যারা অপেক্ষাকৃত অসহায় ও দুর্বল তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। (শামায়েল)

৫. স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য হাসিমুখে কথা বলা, বিনোদনমূলক কথাবার্তা বলাও সুন্নত। (খাসায়েল)

৬. ফজর নামাযের পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এশরাকের সময় পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকতেন। কখনও সাহাবীগণের সাথে গোল হয়ে বসে কথাবার্তা বলতেন। (খাসায়েল)

৭. মুসলমান ভাইদের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করবে।

-(তিরমিযী)

৮. যে কোনো যানবাহনে মালিকের অনুমতি ছাড়া সামনের দিকে বসে পড়া ঠিক নয়। কোনো পশুর উপর সওয়ার হওয়ার বেলায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পশুর মালিককে আগে বসতে

বলতেন। (মেশকাত শরীফ)

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে কবুল করুন, আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এবং আমাদের তওবা কবুল করুন, কেননা আপনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।